একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Narrator-Krishna Context: 'The last few days of Shri Krishna'

কথক-কৃষ্ণ সন্দর্ভ: 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন'

Name of the Author: **Dr. Paramita Banerjee Mondal**

Affiliation: **Assistant Professor, Bengali Department**
The Sanskrit College And University, Kolkata
West Bengal, Kolkata

Abstract: The construction of the character of Shri Krishna has attracted our attention since the beginning of Bengali literature. The construction of the character of Krishna has evolved repeatedly in accordance with the demands of the times. The moto in the 'Shri Krishna Kirtan' of the thirteenth century and in the 'Shri Krishna Vijay' of the fourteenth century both are purposeful constructions. In the thirteenth century, it was easier to construct Krishna as an uncouth, sensual lover-cowherd than to establish his excellence in diplomatic skills for the self-defense of the Bengali nation. In the era of deism, constructing a narrative of religion without any strings attached was against the character of the time. In the fourteenth century, due to the demands of time, Krishna's rajasic form was created for self-defense. Being born in a body made of the five elements, it becomes necessary to accept the fate. Even as a full incarnation, Sri Krishna himself is no exception. Despite being omnipotent, he silently accepted the curse of Gandhari. Due to the cruelty of fate, Yogeshwar Sri Krishna remained a silent spectator of the destruction of the Yadu dynasty.Even in the darkest part of the human heart, there is a constant battle, the consciousness as the seer is a silent, detached spectator like Shri Krishna. The stream of life, thoughts and memories flowing at the junction of birth and death vibrates in the past and the future; but the forgetfulness of whether life is eternal or existing in the present is an obstacle to the realization of the Self. The cycle of karma revolves from the forgetfulness of the Self and the cycle of birth is built on the basis of that karma. Indian spiritual philosophy teaches us that.In this narrative built on a perfect causal principle, the storyteller has given a clear idea about the final outcome of Shri Krishna's life. A logical presentation of Indian spiritual philosophy, karma, destiny, the cycle of time, and the causal tradition is in the storyteller Sanjeev Chatterjee's 'The Last Days of Shri Krishna'. This construction of Krishna in the age of humanism makes us think. Is the author's hidden desire an attempt to give a new lesson in spirituality to human life? In the context of the universe, is karma the controller of everything?

Keywords: Purna Avatar, Kshetra-Kshetragnya, Mahakalakalchakra, Karma, Inquiry, Doubt, Creator-Seer, Self-Conflict, De-construction.

কথক-কৃষ্ণসন্দর্ভ : 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন'

ড. পারমিতা ব্যানার্জী মণ্ডল

(১)

'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ঐ সালেই এবং ২০২৩ সাল পর্যন্ত দশবার মুদ্রিত হয় আনন্দ প্রকাশন থেকে। ২০১৮ সালে গ্রন্থটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পায়। ২০২০ সাল থেকে এর ই-বুক আমাদের কাছে সহজলভ্য। উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার মাপকাঠি অবশ্যই মুদ্রণ , সংস্করণের পরিসংখ্যান নয়। আকাদেমির পুরস্কার প্রাপ্তি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের একটি কারণ হতে পারে। তবে নামের তাৎ পর্য খোঁজার প্রয়াসে এই উপন্যাসের পসার বৃদ্ধি বলে মনে করার সঙ্গত কারণ মনে উঁকি দেয়। আখ্যানের স্বল্প পরিসরে বৃহৎ কলেবর ভারত যুদ্ধ বা মহাভারতের কাহিনি নতুনরূপে সজ্জিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমাপ্তি দিয়ে আখ্যানের পটভূমির সূত্রপাত হলেও ফ্লাশব্যাক বা পশ্চাদাবোলকন পদ্ধতিতে কৃষ্ণ চরিত্রের বিবিধ স্তর উন্মোচন কথাকারের মূল প্রতিপাদ্য। কৃষ্ণের প্রেমিক সত্তা অপেক্ষা রাজসিক কূটনৈতিক সত্তা এখানে অধিক উজ্জ্বল। কৃষ্ণ স্বয়ং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই এই অসীম তত্ত্বের অবতারণা থেকে হস্ত-পদ মুক্ত জগন্নাথ রূপে বিশ্বদ্রষ্টা হিসেবে বিরাজমান হওয়া পর্যন্ত কাহিনির যাত্রা সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা লেখক করেছেন। কাহিনির মূল স্রোতের গতি এবং গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করেছে গান্ধারী , অর্জুনসহ পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী এবং স্বয়ং কৃষ্ণ চরিত্রের জন্মান্তর প্রবাহের ধারা। কাহিনি পরিবেশনের লঘু চালে পাঠককে সম্মোহিত করে বিভ্রান্ত করার নির্মাণ শৈলীতে লেখক চতুরতার পরিচয় দিয়েছেন। মাহাভারতের বিশাল অরণ্য এত ঘন ও সুবৃহৎ যে পরম্পরার সূত্র নির্ণয় রীতিমত আয়াসসাধ্য; এর সঙ্গে যখন কথকের ভূমিকায় বিবিধ স্বরের সুপরিকল্পিতভাবেই অগোছালো ব্যবহার এবং মানব ও দেব স্বরূপকে কৌশলে গুলিয়ে দেওয়ার পন্থা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় অবলম্বন করেন তখন পাঠকের কানে বাজতে থাকে 'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

প্রাচীন-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে দেব নির্ভরতার তালিকায় সীলমোহর দেওয়া বহু পূর্বেই হয়ে গিয়েছে। নবজাগরণের আলো আধুনিকতার চটক , আত্মসমীক্ষার পরাকাষ্ঠা এসব নাকি সভ্যতার আগ্রগতির মানদণ্ড। তাই দেববাদ নয় মানবতাবাদের মূল সুর সাহিত্য সাধনার একমাত্র পথ। বেশ , তা-ই সত্য বলে মানতে গেলেও তো অতীতের পুঞ্জীভূত সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। চলুন আমরা স্মরণ করি গল্প কথার ঊষালগ্ন – পোড়া গাছের ডালের কালির আঁচড়ে আঁকা ছবি বা শব্দের আখরে আঁকা জীবন। গল্পের এই যাত্রা শুরুই হয়েছিল 'নঞর্থক থেকে সদর্থকের অভিমুখে' ; 'অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার অভিমুখে'। মানুষের যন্ত্রণা , মনের মাঝে লালিত ইচ্ছার অপূর্ণতা যা হয়তো বাস্তবে রূপায়ণ সম্ভব নয় , সেই অসম্ভবের সম্ভাব্য রূপকল্প হল সাহিত্য।

(২)

হিন্দু ধর্ম-দর্শন অনুসারে ক্ষীরোদ সাগর নিবাসী শ্রীবিষ্ণুরপূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ। মানুষকে মানুষের স্বরূপ বোঝাতে স্বয়ং ঈশ্বর কখনও পূর্ণ, কখনও অংশ আবার কখনোবা খণ্ড রূপে আবির্ভূত হন মনুষ্যকোটিতে। সাধকভেদে জীবকোটির সাধক অপেক্ষা ঈশ্বরকোটির সাধক স্বতন্ত্র। জীবকোটির সাধকের মানবজীবন আত্মজ্ঞানলাভ এবং নির্বিকল্প সমাধি উপলব্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে ঈশ্বরকোটির সাধক বা আধিকারিক পুরুষের জীবনের উদ্দেশ্যই দেবকার্য সাধন লোকশিক্ষা ও জগতকল্যাণ সাধন, বিস্মৃত শাশ্বতের স্মরণ করিয়ে মুক্তির পথ উন্মুক্ত করা। অদ্বৈত- ব্রহ্মজ্ঞানের স্তরভেদ অনুযায়ী জ্ঞানোপলব্ধির স্তরে সাধকভেদ চার প্রকার – ব্রহ্মবিদ, ব্রহ্মবিদবর, ব্রহ্মবিদবরীয়ান ও ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ। জীবকোটির সাধক ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হলেও বিজ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছোতে অক্ষম। ঈশ্বরকোটির সাধক বা আধিকারিক পূর্ণ ভগবদ সত্তায় বিলীন থেকেও মায়াকে সজ্ঞানে আশ্রয় করে জীবলোকে মানব জীবন যাপন করতে সক্ষম।জীব-জগতের কল্যাণের নিমিত্ত পূর্ণাবতারের আবির্ভাব হয়। জগত-জীবন মায়াপ্রপঞ্চ এই সত্যেজ্ঞানে স্থির থেকে শ্রীকৃষ্ণ জাগতিক সমস্ত কর্ম নির্লিপ্তভাবে, নির্বিকারে সম্পাদন করেছেন। সদা জাগ্রত চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণতাই জন্মান্তর বা কর্মফলে আবদ্ধ হন না।কিন্তুকায়ারূপ দেহ মায়ার অধীন হওয়ায়দেহ কর্মফলের ভোক্তা।কার্যকারণসূত্রে লিপিবদ্ধ জগতের সেই নিয়মেই ক্ষুদ্রকাল নিয়তই মহাকালের গর্ভে পতিত হচ্ছে – কাল এবং মহাকালের নিরবচ্ছিন্ন লয়বদ্ধ অখণ্ড সত্যের ধারণা দান করা শ্রীকৃষ্ণের মানব জন্মের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই মানব দেহধারী শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হয়েও দেহগতভাবে কর্মফল ভোক্তা। এপ্রসঙ্গে মহাভারত আলোচক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মন্তব্য স্মরণযোগ্য -

‘কৃষ্ণ যতই মেধাবী, যতই কূটবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হন না কেন, অথবা হন না তিনি ঈশ্বর-মনুষ্য শ্রদ্ধার চরম আসনে অধিষ্ঠিত, কিন্তু তিনি যখন নরলীলা মনুষ্য–ব্যবহারী, তখন জীবনের ধর্ম তাঁকে পালন করতেই হবে। সে ধর্মে যদি ফাঁকি থাকে তবে ঈশ্বরকেও তার ফল ভোগ করতে হবে। এই নিরিখে গান্ধারী অভিশাপ একটি রূপকমাত্র।’[১]

মানবদেহ পঞ্চভূতেগড়া শরীর, তার ক্ষয় অনিবার্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের প্রতি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণী – ‘আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল।’ কিন্তু ঐ, মনুষ্যযোনিতে আবির্ভাব হলে মনুষ্যোচিত কর্মফল ভোগের ধারা আবর্তিত হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশও যার আদি-অন্ত ধ্যানে খুঁজে পান না, সেই বিধির বিধিপরব্রহ্মশ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে বিধির কাছে নত হন স্বেচ্ছায়। এখানেই আখ্যানটি তাৎপর্যমণ্ডিত; মনুষ্যরূপী কৃষ্ণের জীবনপট আখ্যানের পরিধি অতিক্রম করে বৃহত্তর অর্থে লোকশিক্ষার পাঠ হয়ে ওঠে।কথক-কৃষ্ণ সংবাদে কথক আত্মগত দ্বিরালাপের কৌশলে অর্জুন-কৃষ্ণ সংবাদের অবতারণা করে পূর্ণাবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের কারণ ব্যক্ত করেছেন – ‘জীবমাত্রই ধর্মাধর্মকর্মবশে জন্মগ্রহণ করে, আমি কিন্তু কর্মপরতন্ত্র নই শুধু জগতের কল্যাণসাধন করব এই সংকল্প নিয়ে নিজের ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে আশ্রয় করে নরদেহ ধারণ করে জগতে আবির্ভূত হই।’[২]

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ এবং তাঁর স্বরূপ পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েই আখ্যানকার আরোপিত কথকের হাতে আখ্যানের রশি ছেড়ে দিয়েছেন। এই আখ্যান হয়ে উঠেছে কথক-কৃষ্ণ সন্দর্ভ; আবার শুধু কথকের প্রশ্ন, সম্ভাব্য উত্তর নয় বিবিধ চরিত্রের প্রশ্ন, বিবৃতি মিলিয়ে আখ্যানটি একইসঙ্গে বহুস্বরিক।

কুরুক্ষেত্রের শ্মশানপুরীতে গান্ধারীর আত্মবিলাপের মধ্য দিয়ে আখ্যানের শুরু। তিনি খুঁজছেন কালের নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণকে। মনের তূন প্রশ্নবাণে পূর্ণ , অবলা নারী বাঙ্ময় হয়ে সেইসব প্রশ্নবাণ ছুড়ছেন মাধবের দিকে। বেদব্যাসের বরে দিব্যদৃষ্টির অধিকারী গান্ধারী কাল পারম্পর্য অনুসারে সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণকে। নারীর মমত্ব–মায়া সংসারের রক্ষাকবচ , সেই বিচক্ষণতা থেকেই গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। কালচক্রের গতি কৃষ্ণ চাইলেই পরিবর্তন করতে পারতেন , কিন্তু করেননি, তাই পতিপরায়ণা গান্ধারীর ক্ষোভেউদ্গতহয়অভিশাপ -

'... তুমি স্বেচ্ছায় কুরুকুলের বিনাশে উদাসীন রইলে , অর্থাৎ তুমি জেনেশুনে এই বংশকে বিনষ্ট হতে দিলে। এ তোমার মহাপরাধ, এর ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে।'[৩]

ধর্ম সংস্থাপনের জন্য কৌরব-পাণ্ডবদের জ্ঞাতি সংঘর্ষের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত কৃষ্ণ নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কৌরবের অহং বোধের বিনাশ এবং পাণ্ডবের আত্ম সমীক্ষার উন্মেষ ঘটানোর জন্যই কৃষ্ণের এই নির্লিপ্ততা। কিন্তু গান্ধারী মধুসূদনের পরম ভক্ত , মাতৃ সত্ত্বার করুণ আর্তিজনিত অভিশাপ তাই মধুসূদন মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। গান্ধারীর অভিশপ্তবাণী সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো , কিছুই তলিয়ে যায় না বরং ফিরিয়ে দেয় যথারীতি –

'গোবিন্দ! যেহেতু পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত জ্ঞাতি কৌরব ও পাণ্ডবগণকে তুমি উপেক্ষা করেছ , ... মধুসূদন! আজ থেকে ছত্রিশ বছর পরে তোমার জ্ঞাতি , মন্ত্রী ও পুত্রগণ সকলে পরস্পর যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যাবে।'[৪]

এতদূর পর্যন্ত ক্ষোভ উদ্গীরণে গান্ধারীর অভিশাপ শেষ হতে পারত , কিন্তু শ্মশানের মর্মন্তুদ নিস্তব্ধতা আর পতি-পুত্রহীনা নারীদের সমবেত কলরোলে বধির গান্ধারী আরাধ্য দেব শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যলীলা সমাপনের পথটিমর্মান্তিক অভিশাপের রূপকে প্রশস্ত করে দিলেন –

'স্বজন শ্মশানে কৃষ্ণ তুমি মরবে , তোমাকে মরতে হবে , মরতে হবে, একেবারে একা, অতি হীন মৃত্যু।'[৫]

এপ্রসঙ্গে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মহাভারত ব্যাখ্যার একটু অংশ দেখে নেওয়া যেতে পারে:

'ধর্ম বলতে ব্যাস কোন অতিলৌকিক ব্যাপার বোঝেন না ,...। ধর্ম বলতে তিনি জীবনের ধর্মই বোঝেন, গোটা মহাভারতে এই জীবন-ধর্মের কাহিনীই রসে , ব্যাঞ্জনায় বিধৃত। ব্যাস জানেন জীবনের ধর্মে কতগুলি নিয়ম আছে, নীতি আছে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ, তার ফল তাঁকে পেতে হয়েছে। ... আবার ব্যাসের ধারণায় যিনি উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন, তাঁকেও কতগুলি নীতি-নিয়ম মানতে হয়, না হলে শেষরক্ষা হয় না।'[৬]

যদিও মহাভারত আলোচক ভাদুড়ী মশাইয়ের এই ব্যাখ্যার প্রতিপাদ্য বৃহত্তর; সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে শুধু 'জীবন নিয়ম নীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ' অর্থা ৎ কার্য-কারণবাদের আওতাধীন এটুকু নির্যাস গ্রহণের কারণেই উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সংযোজন। এখানেই মানবতার পাঠ নিহিত রয়েছে।

কথক ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনুধাবন করে বলেন –

'আপনি ধর্ম। কেতাবি ধর্ম নন। বসে আছেন বাস্তবের আসনে, যা প্রতিমুহূর্তে পাল্টাচ্ছে।'[৭]

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শাশ্বত, চিরনবীন, অনন্ত, নিত্য, মুক্ত, চৈতন্য। মায়ায় বশীভূত হয়ে কালের গতিকে রুদ্ধ করার প্রয়াস তিনি করেন না; তিনি শুধু দ্রষ্টা – স্রষ্টা অবতীর্ণ হন দ্রষ্টার ভূমিকায়। একমাত্র ব্রহ্মশাপ বৃষ্ণিবংশ ধ্বংসের কারক হতে পারে একথা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাত ছিল তাই পুত্র শাম্ব ও তার সখাদের অনৈতিক কার্যকলাপ দেখেও তিনি নির্বাক থেকেছেন। দ্বারকার কাছে স্থিত 'পিণ্ডরক' নামক তীর্থে আগত বিশ্বামিত্র, ভৃগু, দুর্বাসা, অঙ্গীরা, বশিষ্ঠ নারদাদি অনান্য ঋষিগণের সম্মুখে ছলনার আশ্রয়ে অশালীন ক্রীড়ায় মত্ত শাম্ব গর্ভবতী নারীরূপে পুত্রসন্তান কামনায় উপস্থিত হন। ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণ প্রদত্ত ব্রহ্মশাপ অব্যর্থ; তার থেকে নিস্তার লাভ অসম্ভব। 'কী আর কহিব ওহে মন্দগণ, মুষল হইবে গর্ভে কুলের নাশন!!'[৮]

তৎক্ষণাৎ প্রথম অভিশাপের ফল হস্তগত –শাম্বের কৃত্রিম উদর থেকে নির্গত হয় 'মুষলখণ্ড'। দ্বিতীয় অভিশাপ শীঘ্রই ফল দর্শাবে। সমাধানের পথ জানতে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে শাম্ব ও অনান্য বন্ধুবর্গ উপস্থিত হলে যদুরাজ আহুক সাগরের তীরে গিয়ে ঘর্ষণের দ্বারা মুষলটিকে পুরোপুরি ক্ষয় করে ফেলার পরামর্শ দেন। কিন্তু কৃতকর্মের ফল নিবারণের নিমিত্ত সমাধানের পথ খোঁজা কীভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তা এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়। ঘর্ষণের পর অবশিষ্ট মুষলের টুকরো সমুদ্রগর্ভে পতিত হলেও বিনষ্ট হয়না বরং তা থেকে নির্মিত বাণের ফলা এবং ক্ষয়িত মুষলচূর্ণ থেকে উৎপন্ন এরকা নামক 'কুশ' ঘাস যদু দুবংশের ধ্বংসের কারণ হয়। লুব্ধক নামক ব্যাধ ঐ মুষলের টুকরো থেকে বাণ তৈরি করেন । অশত্থ বৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট কৃষ্ণের জ্যোতিতে সুবর্ণ হরিণ ভ্রমে জরা (লুব্ধক পুত্র) বাণ নিক্ষেপ করে। স্বজন -পরিজনের অগোচরে, নির্জনে, একান্তে পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগে ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

জীবনের সম্পূর্ণ বৃত্তের যাবতীয় ঘটনাপরম্পরা সর্বদা স্বয়ং নিজ কর্মের উপর নির্ভরশীল নয়, জীবনবৃত্তে সম্পৃক্ত বিবিধ সম্পর্ক এবং ত ৎদ্বারা সম্পাদিত কর্মও সেখানে সংযোজিত হয়। গান্ধারীর অভিশাপ আসলে সমষ্টিগত বা ব্যষ্টিকর্মের নিরিখে প্রদত্ত, ব্যক্তিকর্মের পরিসরে তা সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু তবুও কৃষ্ণ সমষ্টিগত কর্মের ফলভোগে বিচলিত হলেন না কেন ? ব্যক্তি যখন সমষ্টির কৃতকর্মের ভার বহনের উপযুক্ত হতে পারেন তখনই তাঁর উত্তরণ ঘটে। এই উত্তরণের পথ ধরেই মানুষ হয়ে ওঠেন দেবতা, শ্রীকৃষ্ণ হয়ে ওঠেন নরনারায়ণ, পুরুষোত্তম। গান্ধারীর অভিশাপ এবং শ্রীকৃষ্ণের নত মস্তকে তা স্বীকারের তা ৎপর্যআসলেএইযে, 'বৃহত্তর কল্যাণের হেতু আত্মত্যাগ মানবতার পরম ধর্ম।'

(৩)

মানব চরিত্রের দুর্বলতম স্থল হৃদয়; যন্ত্রণার আঘাতে যত বেশি ঝংকৃত হয় প্রজাপতিরূপ স্রষ্টা কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী নব নব জন্ম লাভ করে। সাহিত্য নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান আলোকধারা , রশ্মির তারতম্য কালের নিরিখে অবশ্যম্ভাবী কিন্তু খণ্ডিত দ্রষ্টা পাঠকের পাঠপ্রতীতি ইতিহাসের নবনির্মাণ করে। সাহিত্যের রাজসভায় দেবতা ও মানুষের আসন বিক্ষিপ্ত হয় মাত্র , সমূলে উৎপাটনহয়না। তাই আধুনিককালেও দেবতার দ্বন্দ্বসংকুল মানবায়ন ঘটে। আলোচ্য আখ্যানে আমরা দেখি কলিকালে স্বয়ং ধর্ম-ই সংশয়ান্বিত ; এর একটা সহজ ব্যাখ্যা হতে পারে 'সংশয় বা দ্বন্দ্ব হল কলির ধর্ম'। উপন্যাসের আগাগোড়াই এই সংশয় বর্তমান। সংশয় থেকে জন্ম হয়

কৌতূহল, কৌতূহল থেকে জন্ম নেয় প্রশ্ন , আর তা থেকেই প্রজ্বলিত হয় জ্ঞানাগ্নি ; সেখানেও যতক্ষণ সংশয় থাকে ততক্ষণই জ্ঞানচর্চা সম্ভব , নচেৎ নয়। এইসংশয় থেকে জাত বিপন্নতা মানুষকে প্রতিনিয়ত নবনব জীবনসত্যের সঙ্গে পরিচিত করে। আরোপিত কথকের ভূমিকায় ভক্ত সঞ্জীবচন্দ্র সংশয়ান্বিত, ভগবানের উদ্দেশে তাঁর অজস্র অমীমাংসিত প্রশ্ন। উত্তরের আশায় কথক সময় ব্যয় করতে নারাজ ; বোধ-বুদ্ধির আশ্রয়ে কার্যকারণ বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে প্রয়াসী কিন্তু পরক্ষণেই সম্বি ৎ ফিরলে আত্মসমর্পণ। কথকের চেতনায় নিরন্তর সচল আত্মমগ্ন দ্বিরালাপ যেন ভক্ত-ভগবানের আলাপের নামান্তর। 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন'–এর নির্মাণ সংশয়াকুল কতগুলি প্রশ্নের উপরেই; যার কল্পিত উত্তরের যুক্তিপরম্পরা পাঠকের কাছে বিশেষ বার্তা বহন করে। আরোপিত লেখকের সঙ্গে অদৃশ্যভগবানের কথোপকথন মূল হলেও ; কৃষ্ণ, কুন্তী, অর্জুন, দ্রৌপদী, শিশুপাল, উদ্ধব, দ্রোণ, দ্রুপদ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, লুব্ধক প্রভৃতি কাহিনিবৃত্ত নির্মাণে উল্লেখযোগ্য প্রায় সব চরিত্রের বহুস্বরে সুসজ্জিত এই আখ্যান। অতীত থেকে বর্তমানে অগ্রগমন ও বর্তমান থেকে অতীতে পশ্চা ৎগমনের অনায়াসভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের শেষ দিনলিপির খুঁটিপূজো থেকে বিসর্জন পর্যন্ত কথাযাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছে। দ্রোণ-দ্রুপদ, মৌদগল্য-নালায়নী উপাখ্যানে দ্রৌপদির জন্মান্তর পারম্পর্য, পঞ্চপাণ্ডবের জন্মান্তররহস্য, বিষ্ণুর বিবিধ অবতার বর্ণনা মূলকাহিনির গতিবিধানের সহায়ক হয়েছে। কথক কৃষ্ণকে ক্ষণে ক্ষণে সখাতুল্য পরিহাসে জর্জরিত করেন। কখনও বলেন –

'আপনারজীবনেশুধুসমস্যা, আরথেকেথেকেযুদ্ধ।বড়জীবনেরবড়সমস্যা।'[৯]

কথক কখনও গোপীভাবের অনুষঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ করতে তৎপর হয়ে কৃষ্ণকে তিরস্কার করেন–

'প্রাণ আমাদের দেহে নেই, তোমাতে আছে। আর তুমি কী করছ, মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছ। এদিকে আমাদের যত যন্ত্রণাই হোক, আমাদের মৃত্যু হচ্ছে না। মনের সুখে, প্রাণের সুখে আমাদের বিরহবেদনা প্রতক্ষ্য করো। তোমার জন্য আমরা কেমন ছটফট করছি।'[১০]

কখনও বা সামান্য ভক্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ছদ্ম ঈর্ষার সুরে কথক বলেন –

'গোপীরা আপনাকে মহাপ্যাঁচে ফেলেছে প্রভু! ওরা সাংঘাতিক। সরাসরি আপনাকে তো বলা যায় না। বাবা রে! আপনি ভগবান। আমরা কাতর প্রার্থনা করি –

সংসার সাগরে মগ্নংমামুদ্ধরজগদ্গুরো ,
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দন।
গোপীরা আপনার আত্মস্বরূপ। যা খুশি বলার অধিকারী।'[১১]

আবার কখনও ভক্তিমার্গের সাধনতত্ত্বের কথায় কথক পঞ্চমুখ -

'বাবা রে! এ যে ভক্তিমার্গের মস্ত সাধন। কৃষ্ণভজনের চমৎকার অবস্থা কিছুই জানলুম না, বুঝলুম না, কৃষ্ণমাধুর্যে বিকিয়ে গেলুম।'[১২]

যতভাবেই জানা হোক কৃষ্ণকে জানার যেন শেষ নেই; অনন্তকে জানা তো অন্তহীন হবেই তাই হয়তো কৃষ্ণের স্বরূপ অনুসন্ধানে কথক তন্ত্রসাধনার আভাসও আখ্যানে দিয়েছেন –

'তুমি পদ্মের শ্রীহরণ করেছ, কর্ণিকার মধ্যে গোপনবস্তু আছে জেনেও নিয়েছ। আর জলরাশি দুর্লঙ্ঘতার ভেতর পদ্ম, সেই পদ্মের অঙ্কস্থাশ্রীরূপ নায়িকাকে চুরি করে তোমার নয়নে বন্দি করেছ।'[১৩]

যোগসাধনে আরূঢ় হয়ে দেহস্থচক্র জাগ্রত করে পদ্ম প্রস্ফুটনের মধ্য দিয়ে তৃতীয়নেত্র উন্মীলন করেছেন, তাই তিনি যোগেশ্বর; শিবের মতোই তিনিও পরমযোগী।

(৪)

অর্জুনের প্রকৃত পরিচয় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্মরণ করান আমি-তুমি পৃথকত্ব জ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র, আমি যেরূপ নারায়ণ তুমিও তেমনই নর –

'অনন্যঃ পার্থমত্তস্তং তত্ত্বাশ্চাহং তথইবচ
নাবয়োরন্তরং শক্যং বেদিতুং ভরতর্ষভ'[১৪]

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তোমাতে আমি আর আমাতেই তুমি। 'আমি যেমন তোমা হতে অনন্য, সেইরকম তুমিও আমা হতে অনন্য। আমাদের দুজনের মধ্যে ভেদ ঘটানো কারও পক্ষে সম্ভব নয়।'[১৫]

আবার ব্যাসদেবকথিত বাক্য স্মরণ করে অর্জুন বলেন –

'ব্যাসদেব আমাকে বলেছেন, তুমি সমস্ত মানুষের প্রবৃত্তির হেতু। তুমিই সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে ক্ষেত্রজ্ঞ। তুমিই সর্বভূতের আদি ও অন্ত। তুমিই সব তপস্যার আধার। তুমিই সনাতন যজ্ঞস্বরূপ।'[১৬]

অর্থাৎ শুধু অর্জুনের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে কৃষ্ণ ক্ষেত্রজ্ঞ; আবার প্রাণের আধারক্ষেত্রও তিনি – স্থূলইন্দ্রিয়ে পৃথক বলে প্রতীত হয়। প্রকৃতি মায়াস্বরূপ তাঁতেই জগত প্রকাশিত আর পুরুষ সেই জগতের আধার; অর্থাৎ জগত প্রকৃতিও পুরুষের যুগনদ্ধরূপ- শ্যাম ও শ্যামা একাকার। জীবন-মৃত্যু নাচে তালে তালে; উভয়ই এক মুদ্রার দুই পীঠ। কথক বলেন –

'জন্ম আর মৃত্যু যেখানে এক, তিনিই ভগবান। জীবে এই দুই অবস্থা ভিন্ন।'[১৭]

সন্দিহান চিন্তাস্রোতে কথক কুলহারা হন। মানবরূপী কৃষ্ণের কাছে মানবজীবনের অস্তিত্বের অনিত্যতা ও ক্ষুদ্রত্বের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে নশ্বর জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান -

'কে আপনি, কী আপনি? পথ কোথায়? ... আমি পণ্ডিত নই, ভীরু মানব। দৈত্যের মতো আকাঙ্ক্ষা, থকথকে কালো মৃত্যু, জীবন ঝরে পড়ছে অরণ্যের বৃক্ষপত্রের মতো! কতটুকু সময়ের জন্য বেঁচে থাকার অনুভূতি!'[১৮]

কিন্তু পরক্ষনণেই দেখি জীবনের অনিত্যতার আয়নায় মুখোমুখি লেখকসত্তা আরোপিত কথকের সুপ্তি ভাঙেন, চেতনার আলোয় লোচনসিক্ত করেন। এই আত্মদ্বন্দ্বের দ্বিরালাপ পাঠকেরও সুপ্তিভঞ্জক হয়ে ওঠে।

(৫)

লোকশিক্ষার জন্য অস্তিত্বের সঙ্গে পূর্ণভাবে সংলগ্ন হয়ে শাশ্বতের শিক্ষা দানের জন্যই পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের মানব জীবনের কৃচ্ছসাধনের লীলা পরিমণ্ডল রচনা। 'দুরারোগ্য ব্যাধির একমাত্র দাওয়াই হল ধ্বংস'- কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণের নির্লিপ্ত সম্পাদকের অবস্থান মানবজাতিকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে। লেখকের অভিপ্রায় শাশ্বতের অনুসন্ধান। স্পষ্ট করে সেকথা তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করেননি কিন্তু প্রেম, ভক্তি, তন্ত্র

সবরকম পন্থায় জানতে চেয়েছেন কৃষ্ণের স্বরূপ, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আত্মস্বরূপ উন্মোচনের আখ্যান হয়ে উঠেছে 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন'।

একবিংশ শতকে আখ্যানের কেন্দ্রে কৃষ্ণচরিত্র নির্মাণে লেখকের তাগিদ যেন মানবের আজন্মলালিত ক্ষুধার পরিপুষ্টি সাধনের নবপন্থা – 'খণ্ড হয়ে অখণ্ডকে জানা', 'আত্মস্বরূপ উপলব্ধির' অন্তহীন যাত্রা।

'এক থেকে বহু বহু থেকে এক। এটি একটি বিশেষ তত্ত্ব। এইখানেই প্রচ্ছন্ন আছে সেই সত্য, একই বহু হচ্ছেন। আবার বহু মিলিত হচ্ছে এক-এ। এরই নাম ব্রহ্ম ও জীবজগৎ। জাদুদণ্ডটি রয়েছে মায়াদেবীর হাতে।'[১৯]

আখ্যানে দেখি শ্রীকৃষ্ণ কখনও পুরুষোত্তম, ভগবান কখনও নিতান্তই আত্মজ্ঞানবিস্মৃত সাধারণ মানব। ভক্তহৃদয় মানঅভিমানের পালায় ভগবানের লীলা উপভোগ করে কিন্তু ঋষির উপলব্ধি ধ্যানযোগে; আবার দেবতারা মহাকালের কোলে কালের সৃষ্টি-ধ্বংসের অখণ্ডত্ব প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ ও ভীত। স্রষ্টালেখক দ্রষ্টাকথকের দৃষ্টিতে ক্যালাইডোস্কোপে কৃষ্ণকে দেখেন বহুরূপে -

'প্রভু! এ আপনার কি খেলা! গড়া জিনিস ভাঙা! মহাকালে বসে কালকে চিবোচ্ছেন। ছিবড়ে ফেলে দিচ্ছেন এদিকে ওদিকে। প্রেমিক নিষ্ঠুর! গোপীরা দেখল এক, ঋষিরা দেখলেন আর এক, দেবতারা ভীত।'[২০]

শ্রীকৃষ্ণের যা কিছু ক্রিয়াকলাপ তার সবটাই মনুষ্যোচিত না অলৌকিক এই ধোঁয়াশার পূর্ণ নিরসন এই আখ্যানে হয়নি। কথক রসিকতার সুরে কৃষ্ণকে যত্রতত্র বিদ্ধ করেন-

'অসাধারণ একছায়াবাজি।আপনিভগবান, বাজিকরের খেলা দেখার মতোই নিজের জীবন নিয়ে খেলা করছেন।'[২১]

অথবা কৃষ্ণের পত্নীর সংখ্যার দিকে নজর দিয়ে কথক ব্যঙ্গের খোঁচা দেন –

'দেবলীলা আর মনুষ্যলীলা। দেবতা যখন মানুষ হন তখন তাঁরও কোনও কূলকিনারা থাকে না। আপনি হবেন আদর্শ গৃহী। কিন্তু আপনি যে ভগবান।'[২২]

কিন্তু শেষপর্যন্ত ভক্তভাবে ভাবিতক থাকার একটি চিরন্তন সত্যের উন্মোচন করেছেন। জীবন-মৃত্যুর ভেদ যেখানে মুছে যায়, এই দুইয়ের সংযোগস্থলে যিনি স্থিত তিনিই হলেন পূর্ণযোগী বা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ।

'ঈশ্বর এটি একটি ত্রিভুজ। যজ্ঞবেদিতে যে যন্ত্র আঁকা হয় , সে তো এই ত্রিভুজ , সেটিকে ঘিরে একটি বৃত্ত, সেটিকে ঘিরে একটি আয়তক্ষেত্র। এইটিই তো আপনার ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রেই জীবনরূপ অগ্নির আবাহন।'[২৩]

মানবজীবনের হোমবেদীতে অগ্নি হল জীবনীশক্তি ; যাপিত জীবনের নিত্য কর্মই এই হোমের যোগ্য আহুতি। এইভাবে সম্পাদিত কর্মচক্র জন্মচক্রমুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ হোমের ভোক্তা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রক, কর্মের অধীন নন; জন্মচক্রের অধীন নন। নির্লিপ্ত দ্রষ্টা হয়ে তিনি সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভালো-মন্দ সবকিছু আকণ্ঠ পান করছেন। আরোপিত কথক প্রশ্নমালা উত্থাপন করে উত্তরও বাতলে দেন যাপিত জীবনের ঈশ্বরানুভূতি থেকে, জীবনধর্মের পাঠ থেকে। তাই কখনও কথক কৃষ্ণের অদ্ভুতলীলার আদি অন্ত না পেয়ে বলেন –

'প্রভু! সবিস্ময়ে বলতে ইচ্ছে করে – বাবা রে! কারণ আমি এতটাই ক্ষুদ্র, আপনার মতো জগৎকারণকে বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। কোথা থেকে কী করছেন, কেন করছেন – এই প্রশ্নের উত্তর যে ধ্যানে জানা যেতে পারে তা আমার নেই।'[২৪]

আবার ঘটনার অগ্রগতির মাঝে মাঝে কৃষ্ণ–কথক সংবাদে কৃষ্ণ শুধুই নীরব শ্রোতা; আত্মগত দ্বিরালাপে অভিমানী ভক্তকথক যাচাই করে নিতে চান কৃষ্ণ অবতারের সম্ভাব্য কারণের সত্যতা–

'আপনি কেন এসেছিলেন? সরেজমিনে দেখতে এসেছিলেন। মায়াই হোক আর সত্যই হোক, জগৎ ক্রমশ ঘটনাবহুল ও বহুজনসংখ্যায় ভরে উঠবে। ভগবানের নিয়ন্ত্রণ কতটা? আর মানুষের কর্মফল কতটা শক্তিশালী।'[২৫]

কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ জগতের কালো দূর করা; আপনা থেকে আপনিকে মুক্ত করার লীলায় মগ্ন পরমেশ্বর। ব্যাসদেবের কাহিনির অনুষঙ্গে কথক নতুন করে মিলিয়ে নিচ্ছেন কৃষ্ণের মর্ত্যে অবতরণের কারণ ও তাঁর কার্যকলাপ। যেসব চরিত্রের সহাবস্থানে লীলাক্ষেত্র রচনা করেছিলেন তাদের পূর্বাপর কর্মফল ও স্বরূপ উদ্ঘাটন করে নাটকের অঙ্ক সাজিয়েছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। পাশা খেলায় নারীর লাঞ্ছনা হবে জেনেও শ্রীকৃষ্ণ তা হতে দিয়েছেন। কী নিষ্ঠুর তা শুধুমাত্র লোকশিক্ষার জন্য? নারীর লাঞ্ছনা, অবমাননা, অবহেলা, অবদমন যেকোনো জাতির ধ্বংসের কারণ এই সত্য জানাতে দ্রৌপদিকে আত্মবলিদান দিতে হল। তবু হায়! কত সহস্র শতাব্দী অতিবাহিত হল কিন্তু আজও মানবজাতি সেই শিক্ষা আয়ত্ত করতে অক্ষম থেকে গেল। কথকের কটাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি –

'আপনিও তো ছকে সাজানো ঘুঁটিতে চাল দিচ্ছেন। আপনি অবশ্যই সেইদিকে এগোচ্ছেন, যেখানে পুরনো যা কিছু থাকবেনা। নতুনকে আসতেই হবে। পীতবসনধারী প্রভু আমার, আপনি যে চিরনবীন।'[২৬]

কালের প্রবাহ স্তব্ধ করার সাধ্য স্বয়ং পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের নেই। তবে কৃষ্ণ নির্লিপ্ত থাকতে পারেন কারণ তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম; তাঁর জ্ঞানাঞ্জন স্থূলইন্দ্রিয়ের বশীভূত নয় কিন্তু সাধারণ মানুষের চর্মচক্ষুই সার মর্মচক্ষুর অধিকারী কতিপয় জন। এহেন জীবকুলের নিস্তার সাধন করে কার সাধ্য। আখ্যানকার কাহিনি অবতরণের প্রারম্ভিকপর্বেই শ্রীকৃষ্ণকথিত গীতার ভাষ্য পাঠককে স্মরণ করিয়েছেন -

'যদাযদাহিধর্মস্য গ্লানির্ভবতিভারত
অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজামহ্যম্
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে।'[২৭]

শ্রীকৃষ্ণের এই অমোঘবাণী মানুষের কণ্ঠস্থ হলেও নীলকণ্ঠের বিষের মতো তা কণ্ঠেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, মানুষের মর্মে মর্মে প্রবিষ্ট হয়নি। আখ্যানের শেষ পর্বে লেখক কৃষ্ণ–কথক সন্দর্ভের ইতি টেনেছেন আশার ব্যঞ্জনায়। শ্রীকৃষ্ণের ফিরে ফিরে আসার বাণীকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন হস্তপদমুক্ত জগন্নাথ স্বরূপের মধ্যে দিয়ে –

'যাবেন কোথায় প্রভু! ভক্তদের বন্ধন! সমুদ্রের তীরেই চির অবস্থান – প্রভু জগন্নাথ, ভ্রাতা বলরাম মধ্যে সুভদ্রা। কোটির কণ্ঠে আকুল আহ্বান,

জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।'[২৮]

পাঠক আমি পাঠ শেষেও সন্দিহান মানবজাতি হস্তপদমুক্ত জগন্নাথের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হবে? যুগেযুগে সাধক, অবতার 'আমিত্ব বিসর্জনের মধ্য দিয়ে জগৎমুক্তির' যে আলোকবর্তিকা দিয়ে গেলেন; কলির জগন্নাথের হস্তপদমুক্ত নবরূপ যে কর্তাভাব বা কর্তৃত্বের ভাবমুক্ত চৈতন্যের প্রতীক তার আভাস দিতেই লেখক 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' আখ্যানে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিরোভাব থেকে জগন্নাথে এসে বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছেন। একুশশতকে কৃষ্ণচরিত্রের বিনির্মাণের এই দুঃসাহসিক প্রয়াস একথাই স্মরণ করিয়ে দেয় অধাত্ম্যচেতনা ও মানবজীবন চিরকাল পরস্পরের বক্ষলগ্ন হয়ে জারণ-বিজারণ, আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বিমেরু টানাপোড়েনে মানব ইতিহাস বুননের নিরবচ্ছিন্ন ধারা প্রবহমান রেখেছে। দেববাদ বা মানববাদের স্থূল যুগধর্ম নির্মাণ সাহিত্যের অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ করে। সীমার মাঝে অসীমের পদধ্বনি যেমন জীবনের ধর্ম তেমনই তা সাহিত্যেরও ধর্ম।

তথ্যসূত্র

১।ভাদুড়ীনৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের ভারত যুদ্ধ এবং কৃষ্ণ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সং, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, কথামুখ অংশ
২। চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীব, শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন, আনন্দ পাবলিশার্স, দশম মুদ্রণ, জুলাই ২০২৩, পৃ.২৫
৩। তদেব। পৃ.১৪
৪। তদেব, পৃ.১৫
৫। তদেব, পৃ.১০০
৬।ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের ভারত যুদ্ধ এবং কৃষ্ণ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সং, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, কথামুখ অংশ
৭।চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীব, শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯
৮।তদেব। পৃ.৯৪
৯।তদেব। পৃ.৪৫
১০।তদেব। পৃ.৫৩
১১। তদেব। পৃ.৫৫
১২। তদেব। পৃ.৫৬
১৩। তদেব। পৃ.৫৫
১৪-১৫। তদেব। পৃ.২৯
১৬। তদেব। পৃ.২৭
১৭-১৮। তদেব। পৃ.৩৫
১৯। তদেব। পৃ.৮৬
২০। তদেব। পৃ.৩৪
২১। তদেব। পৃ.৮৬
২২। তদেব। পৃ.৮৪
২৩। তদেব। পৃ.৩৫

২৪। তদেব। পৃ.৮৭-৮৮

২৫। তদেব। পৃ.৮৮

২৬। তদেব। পৃ.৭১

২৭। তদেব। পৃ.২৫

২৮। তদেব। পৃ.১০৪